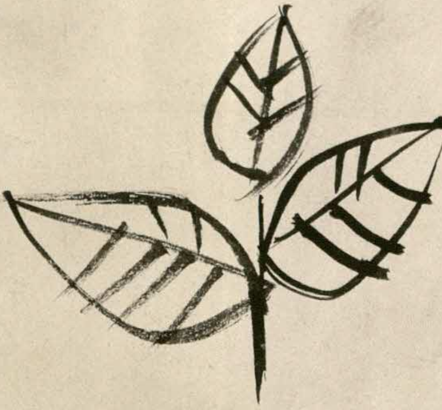
Code No 4.7
SL No 53

368

Reprint. In the Press

চেনা অচেনা গাছপালা



রবীন বসু সম্পাদিত

দেশ বিদেশের গাছপালা

তারকমোহন দাস

আফ্রিকার গভীর অরণ্যে এক ধরনের উদ্ভিদ বাস করে, সাধারণ উদ্ভিদের মতই তাদের বাইরের চেহারাটা বেশ নিরীহ। তারা সাঁপল ডাল-পালা মেলে ওঁৎ পেতে বসে থাকে শিকারের আশায়, হঠাৎ ভুল করে কোন জীব-জন্তু বা মানুষ তাদের নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়লেই সবু লিকলিকে ডালগুলি প্রসারিত করে অক্টোপাসের মত আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে বেঁধে ফেলে, তারপর বিষাক্ত কাঁটার ঘায়ে শিকারকে আচ্ছন্ন করে ধীরে ধীরে তার রক্ত মাংস হজম করতে থাকে। কয়েকদিন পরে তাদের বাহুপাশ শিথিল হলে দেখা যায় শিকারের হাড়গুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঘোড়াসুদ্ধ একটি ঘোড়-সওয়ারকেও তারা এইভাবে হজম করে ফেলবার ক্ষমতা রাখে। উদ্ভিদ সম্পর্কে এ গল্প খুবই রোমাঞ্চকর এবং চিত্তাকর্ষক তাতে সন্দেহ নেই, তবে এর সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। এই ধরনের মানুষখেকো উদ্ভিদ পৃথিবীতে নেই, পৃথিবীতে কোনদিন ছিলও না। এই গল্পগুলি একান্তভাবে মানুষেরই চিন্তাশক্তি বা দুশ্চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশ বলা যেতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু বিচিত্র প্রজাতির উদ্ভিদ অতি বিস্ময়কর জীবনপদ্ধতি অবলম্বন করে জীবনধারণ করে থাকে। সাধারণ মানুষ তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না, শুধু তাই নয়, অনেক ভুল ধারণাও পোষণ করে থাকে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত লেখকরা এজন্য বেশ কিছুটা দায়ী। চমক সৃষ্টি ও লেখাকে আকর্ষণীয় করে তোলা যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এইসব উদ্ভিদের বাস্তব জীবনপদ্ধতির মধ্যেই তার যথেষ্ট উপাদান আছে, কল্পনার আশ্রয় নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না, উদ্ভিদ সম্পর্কে সাধারণের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টিরও সেখানে অবকাশ ছিল না।

পৃথিবীতে উদ্ভিদরাই মনে হয় যেন আদর্শ অহিংস জীবনযাপন করে থাকে। তাদের আক্রমণ করলে কোন প্রতি-আক্রমণ করে না, তাদের ঝাড়বংশে নিধন করবার সংকল্প করলেও তারা কোনো প্রতিবাদ জানায় না। কিন্তু উদ্ভিদকে সবংশে নিধন করা খুবই শক্ত, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী এই বিষয়ে তেমন সাফল্য অর্জন করে নি। অহিংসা-নীতি একমাত্র উদ্ভিদরাই মনে হয় অত্যন্ত কার্যকর ভাবে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে চলে, এটাই তাদের বেঁচে থাকবার কৌশল। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে উদ্ভিদের আধিপত্য তাই মোটামুটি অব্যাহতই আছে জীবসৃষ্টির সূচনা থেকে। উদ্ভিদের আধিপত্য আছে বলেই আমরা আজও খেয়ে পরে বেঁচে আছি। উদ্ভিদ না থাকলে আমাদের অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা না থাকলে উদ্ভিদের তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আদৌ নেই। একথাটা মানুষের কাছে তেমন মুখরোচক নাও হতে পারে, তবে এটি একটি বাস্তব সত্য।

উদ্ভিদের জীবন পদ্ধতি বহু বিচিত্র ধারায় এগিয়ে গেছে। এদের কয়েকটি গোষ্ঠী ঠিক অন্যান্যদের মতো সর্বজীবের প্রতি নিস্পৃহ, সর্বংসহ নয়, তারা সুযোগ পেলেই ছোট ছোট পোকা মাকড় ধরে হজম করে এটা সত্য। অন্যান্য উদ্ভিদের মতো এরাও সূর্যের আলোয় নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারে এবং তা সত্ত্বেও ফাঁক পেলে কীট-পতঙ্গ শিকার করে তাদের মাংস হজম করবার সুযোগ হারায় না। খাদ্য বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত এরাই সব থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত জীব। এইসব পতঙ্গভুক উদ্ভিদ সম্পর্কে সাধারণের মনে একটা ভুল ধারণা আছে তা হল এরা শুধু পতঙ্গ খেয়েই জীবনধারণ করে, এই ধারণাটাও ঠিক নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবটুকু খাদ্যই এরা অন্যান্য সবুজ উদ্ভিদের মত সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে তৈরি করে নিতে সক্ষম, পতঙ্গদেহের জৈব পদার্থ অনেকটা 'ফাউ' হিসাবেই এরা গ্রহণ করে থাকে।

পতঙ্গভুক উদ্ভিদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধরনের শিকারী হল ভিনাস ফ্লাইট্রাপ, এটি আমেরিকায় পাওয়া যায়। পতঙ্গ শিকারের ব্যাপারে এই ভিনাস ফ্লাইট্রাপ সকলকে পিছনে ফেলে প্রায় পশুর স্তরে এসে পৌঁছেচে। এদের পাশবিক আচরণ দেখে উদ্ভিদ জাতি নিশ্চয়ই লজ্জা বোধ করত অবশ্য যদি তাদের লজ্জা বোধ শক্তি আদৌ থাকত। ভিনাস ফ্লাইট্রাপের পাতার প্রান্তভাগটি বইয়ের মতো বা ঝিনুকের খোলার মতো দুই ভাগে খোলে ও বন্ধ হয়। প্রতিটি ভাগে তিনটি করে কাঁটা আছে, কিনারাগুলি খাঁজ কাটা, কোনো কীট বা পতঙ্গ একটি কাঁটা স্পর্শ করলেই পাতাটি দুইভাগে ভাঁজ হয়ে কিনারায় কিনারায় জুড়ে যায়, যার মধ্যে পতঙ্গটি হয়ে যায় বন্দী। তারপরে এই অন্ধকূপে আবদ্ধ হয়ে পতঙ্গটি

ছট্‌ফট্‌ করতে করতে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করে এবং পাতার গ্রন্থি হতে নিঃসৃত একরকম পাচকরসে মৃত পতঙ্গটির দেহ জীর্ণ হতে থাকে। ঐ তরল জৈবপদার্থ উদ্ভিদ পাতার মাধ্যমেই শোষণ করে এবং ক্রমশ হজম করে ফেলে। হজম শেষ হলে পাতাটি আবার দুইভাগে খুলে যায়। কতবড় প্রাণী এপর্যন্ত উদ্ভিদ এইভাবে শিকার করেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে সি. জে. হাইল্যাণ্ডার নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন—"একটি ছোট ব্যাঙ"—এটাই হল উদ্ভিদের ধরা এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় শিকার, কিন্তু তাই বা কম কি?

আমাদের দেশেও বেশ কয়েকরকম প্রজাতির পতঙ্গভুক উদ্ভিদ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ড্রসেরা ইউট্রিকিউলেরিয়া (একরকম জলজ ঝাঁঝি). ও খাসিয়া পর্বতের কলস উদ্ভিদ প্রধান। খাসিয়া পর্বত কলস উদ্ভিদের আদি বাসস্থান, এদের প্রজাতির তাই নাম দেওয়া হয়েছে নিপান্থাস খাসিয়ানা। কলস উদ্ভিদের পাতাগুলি লম্বা, পাতার ডগাটি দড়ির মত এবং তার প্রান্তে চার থেকে আট ইঞ্চি লম্বা একটি অতি চমৎকার কলস বসান থাকে। কলসের মুখে একটি ঢাকনি থাকে আধখোলা অবস্থায় লাগান। কলস উদ্ভিদ সম্পর্কে সাধারণের মনে একটা ভুল ধারণা আছে—পতঙ্গরা যখন কলসের মধ্যে প্রবেশ করে তখন মুখের আধ-খোলা ঢাকনিটি বন্ধ হয়ে যায়, পতঙ্গরা আর বেরিয়ে আসতে পারে না। এই ধারণাটি সত্য নয়। এই ঢাকনিটির কোন মুভমেন্ট নেই,—এটি একই অবস্থায় থাকে। ভিনাস ফ্লাইট্রাপের পাতার প্রান্তভাগটি কিন্তু ঝিনুকের খোলার মত দুইভাগে খোলে ও বন্ধ হয়। সেটা কি করে সম্ভব হয়? উদ্ভিদের তো কোন নার্ভ নেই, কোন মস্তিষ্কও নেই, ওরা কি করে বুঝতে পারে পতঙ্গ এসে বসেছে ফাঁদের মধ্যে, এইবার পাতাটি গুটিয়ে ফেলতে হবে? এই রহস্যের সম্পূর্ণ সমাধান আজও হয় নি। আমাদের দেশের লজ্জাবতীলতার পাতায় হাত দিলে পাতাটি গুটিয়ে যায়, এটা বলা হয়ে থাকে পাতার বৃন্তে পালভাইনাস অংশে জলের চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এটা ঘটে থাকে, আচার্য জগদীশচন্দ্র এই নিয়ে কিছুদিন গবেষণা করেছিলেন।

পৃথিবীর কয়েকটি মরুপ্রায় অঞ্চলে ঘাস জাতীয় একরকম উদ্ভিদ জন্মায় যাদের পাতা বৃষ্টিহীন শুষ্ক আবহাওয়ায় মাসের পর মাস সম্পূর্ণ গোটানো অবস্থায় থাকে, পাতা থেকে জলের বাষ্পীভবন তাতে হ্রাস পায়, গাছগুলি অল্প জলে কাজ চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মরুপ্রায় অঞ্চলেও কালেভদ্রে বৃষ্টিপাত হয়। সামান্য বৃষ্টি পড়লেই পাতাগুলি সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায়। পাতার ওপরই এদের রন্ধ্র (Stoma) থাকে,—অন্যান্য গাছের পাতার তলায়ই রন্ধ্র থাকে। ঐ পাতার সাহায্যেই তখন তারা চোঁ-চোঁ করে বৃষ্টির জল শোষণ করে নেয়। বৃষ্টি থেমে গেলে, আবহাওয়া শুষ্ক হলে পাতাগুলি আবার গুটিয়ে যায়। এদেরও পাতার এই খোলা ও গুটিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টিসুর মধ্যে জলের চাপের (Turgor pressure) হ্রাস বৃদ্ধির সম্পর্ক থাকতে পারে। সেটা এখনও পরিষ্কার ভাবে জানা যায় নি।

দেশী-বিদেশী শুঁটি জাতীয় বহু রকম উদ্ভিদ আছে যাদের যৌগপত্রের ছোট ছোট পত্রকগুলি সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলেই পিঠে-পিঠে জুড়ে গুটিয়ে যায়, আবার সকালে দিনের আলোয় খুলে যায়। ইংরেজীতে একে স্লিপ মুভমেন্ট (Sleep Movement) বলে। কিছু ফুল আছে যাদের রং প্রধানত সাদা, গন্ধ তীব্র, রাতের অন্ধকার নামলেই তারা পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠে, রাতের অন্ধকারেই তাদের গন্ধ তীব্র-ভাবে অনুভূত হয়। যেমন রজনীগন্ধা! বর্ণাঢ্য রঙীন এবং গন্ধহীন ফুল সাধারণত দিনের বেলায় ফোটে। এই ধরনের অনেক ফুল অল্পকিছু সময় পরে আবার বুঁজে যায়,—যেমন পর্টুলাকা গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা। এই খুলে যাওয়া ও বুজে যাবার রহস্যটি এখনও সঠিক ভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিত হয় নি।

বিজ্ঞানীরা আজ জেনেছেন মানুষ সমেত সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহের মধ্যে এক ধরনের ঘড়ির মত যন্ত্র কাজ করে থাকে, যেটি ঠিক ঘড়ির মতই নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিশেষ বিশেষ কাজ করে যায়। শুঁটি জাতীয় অনেক উদ্ভিদের পাতা রাতে গুটিয়ে যায়, সকালে খোলে,—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, সেটি যে ঠিক আলো বা অন্ধকারের প্রভাবে ঘটছে তা নয়,—গাছটিকে যদি সব সময় আলোর মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তাহলে সন্ধ্যার দিকে অন্ধকার না পেলেও তার পাতা গুটিয়ে যায় আবার সকালের দিকে তা খুলে যায়, গাছটিকে তখন অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিলেও এই পাতা খোলা বন্ধ হয় না। গাছটির নিজের মধ্যেই যেন একটা ছন্দ আছে, সে এই ছন্দের তালে তালে ঐ কাজ করে যাচ্ছে, একে বলা হয় জৈবিক-ছন্দ বা বায়োলজিক্যাল রিদম্! এই খোলা ও বন্ধ হবার ঘটনাটি যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ হবে তার কোন স্থিরতা নেই, উদ্ভিদের প্রজাতি ভেদে তা ২২ থেকে ২৮ ঘন্টা পর্যন্ত গড়াতে পারে এবং দীর্ঘকাল যদি শুধু একটানা আলো অথবা একটানা অন্ধকারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তাহলে তার এই ছন্দের তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়,—পেণ্ডুলামের দোলন যেমন নির্দিষ্ট গণিতের সূত্র অনুসরণ করে আস্তে আস্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই জৈবিক ছন্দ যদিও উদ্ভিদের একটি প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং বংশপরম্পরায় তা পরিবাহিত হয়ে থাকে, তবু মজার বিষয় হল এই ধরনের উদ্ভিদদের যদি বীজ থেকে অঙ্কুরিত হবার পর একটানা আলো অথবা একটানা অন্ধকারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তাহলে তারা এই দোলনের ছন্দ আদৌ শুরু করে না, তবে স্বাভাবিক দিনরাত্রির কয়েকবার স্পর্শ পেলেই তারা তাদের আপন ছন্দ খুঁজে পায়।

বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই জৈবিক ছন্দ সম্পর্কে

আজ প্রচুর তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে আরো কয়েকটি উল্লেখ্য হল : সমুদ্রের বুকে ভাসমান এককোষী বা বহুকোষী শৈবাল ও প্রাণীরা আছে যাদের এক কথায় প্ল্যাঙ্কটন বলে। ভোরের দিকে তারা সদলবলে সমুদ্রের ওপরতলে উঠে আসে, দিনের বেলায় সূর্যের আলোর তীব্রতা বাড়লে তারা আবার নীচের দিকে নেমে যায়, সন্ধ্যার দিকে তারা আবার ওপরে উঠে আসে, গভীর রাত্রে তারা আবার নীচে নেমে যায়। তাদের অনুসরণ করে বড় বড় মাছেরাও সদলবলে ওপর-নীচ ওঠা-নামা করে, কারণ ঐ ভাসমান প্ল্যাঙ্কটনই তাদের প্রধান খাদ্য। পুরীতে যারা গেছ তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ নুলিয়ারা ভোরের দিকে, না হয় সন্ধ্যা বেলায় সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরয়, দিন দুপুরে কখনই নয়, কারণ মাছেরা তখন প্ল্যাঙ্কটনদের অনুসরণ করে নীচের দিকে নেমে যায়। এই শৈবালদের আলোর বড় প্রয়োজন, আলোর সন্ধানেই তারা ওপরে উঠে আসে, আলোর তীব্রতা বাড়লে নীচে নেমে যায়, কিন্তু গভীর রাত্রে তারা নীচে নেমে যায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ঐ উদ্ভিদদের বিচিত্র জৈবিক ছন্দের প্রক্রিয়ার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। এই জীব গোষ্ঠীর মধ্য থেকে এককোষী ইউগলেনাকো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে তারা একটানা অন্ধকারের মধ্যেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ওপর নীচ ওঠা নামা করছে। গোনিয়া লাক্স পলিয়েড্রা নামে আর একধরনের সামুদ্রিক শৈবাল আছে রাতের বেলায় তাদের দেহ থেকে বিচিত্র আলোকছটার বিচ্ছুরণ ঘটে দিনের বেলায় তার তীব্রতার যথেষ্ট হ্রাস ঘটে। এই শৈবালদের একটানা আলোর মধ্যে রেখে দেখা গেছে প্রায় ১২ ঘণ্টা অন্তর অন্তর একটি নির্দিষ্ট ছন্দে এই আলোকের তীব্রতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে। ফিডলার জাতীয় কাঁকড়ারা দিনের বেলায় গভীর কালচে রং ধারণ করে, রাতের বেলায় তাদের ঐ রং ফিকে হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এটিও তাদের জৈবিক ছন্দের একটি প্রক্রিয়া।

আমরাও এই জৈবিকছন্দের বশবর্তী। আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কখনও সমান থাকে না। সন্ধ্যার দিকে সবচেয়ে বাড়ে, ভোরের দিকে সবচেয়ে কমে, নির্দিষ্ট ছন্দে সকলকার দেহেই এটা ঘটে থাকে, থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করলেই তা ধরা পড়ে। এটা অবশ্য ধরা পড়ে যখন আমরা জ্বরে আক্রান্ত হই। সন্ধ্যার দিকে জ্বর বাড়ে, ভোরের দিকে জ্বর কমে,—অনেকের ধারণা সন্ধ্যার দিকে অসুখটা বাড়ছে বলে জ্বর বাড়ছে, ভোরের দিকে অসুখটা কমছে বলে জ্বর কমছে। আসলে অসুখটা একই আছে। আমাদের দেহের তাপমাত্রার এই হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মেই—ঐ জৈবিক ছন্দ অনুযায়ী।

শুধু দেহের তাপমাত্রা নয়, আমাদের শরীরের বহুরকম রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে থাকে এই জৈবিক ছন্দের শৃঙ্খলা অনুসরণ করে। আমাদের দেহের অ্যাডরিনালিন, ইনসুলিন প্রভৃতি হরমোন এবং রক্তের সুগার, ক্লোরাইড, কোলেসটেরল প্রভৃতি পদার্থ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিয়মিত ভাবে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে। সকালের দিকে ব্লাড প্রেসার কম থাকে, সন্ধ্যার দিকে বাড়ে।

বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত এই সব তথ্য আজ ব্যাধি নিরাময়ে ও কৃষিক্ষেত্রে নানা ব্যবহারিক কাজেও লাগান হচ্ছে। রোগীদের দেহে কর্টিকোস্টেরয়েড, অ্যাডরিনালিন, ইনসুলিন প্রভৃতি হরমোন ইনজেকসান দেবার আগে জানা দরকার ঐ সব হরমোন ও সুগারের মাত্রা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগীদের রক্তে সবচেয়ে কম কখন থাকে, এই তথ্যগুলি তাই ঐ সমস্ত রোগীদের রোগ নিরাময়েও সাহায্য করছে। ভেড়াদের দেহের মূল্যবান পশমের পরিমাণ বাড়ান হচ্ছে তাদের দিনের কিছুসময় অন্ধকার ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে, কেননা জানা গেছে ছোট দিন ও দীর্ঘ রাত্রির প্রভাবে ভেড়াদের দেহের লোমের বৃদ্ধি বেশি হয়। ঠিক তেমনি বিপরীত ভাবে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে কৃত্রিম ভাবে দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে পোলট্রি ফার্মে মুরগীর ডিমের সংখ্যা বাড়ান হচ্ছে। নানারকম কীটনাশক প্রয়োগ করে ফসলের শত্রু পোকামাকড় মারা হয়। কিন্তু পোকাদেরও একটা প্রতিরোধ শক্তি আছে, সেই প্রতিরোধ শক্তি নির্দিষ্ট ছন্দে কমে বাড়ে। একজাতের শক্তি সবচেয়ে বেশি থাকে, তারপর তার তিন ঘণ্টা বাদে কমে যায়। সুতরাং সূর্যোদয়ের তিন ঘণ্টা পরই পোকার ক্ষেত্রে দেখা গেছে সূর্যোদয়ের সময় এই প্রতিরোধ কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক পদার্থ ছড়ান যুক্তিযুক্ত। শীতকালে যে সব গাছে ফুল ধরে, ফল হয় সেটা শীতের ঠাণ্ডা বা শৈত্যের প্রভাবে ঘটে তা আদৌ নয়, শীতকালের ছোট দিন ও দীর্ঘরাত্রির প্রভাবেই ঘটে থাকে। সুতরাং, গ্রীষ্মকালেও ঐ সব গাছের ফুল ফল আমরা পেতে পারি যদি তাদের কোন কৃত্রিম উপায়ে ছোটদিন ও দীর্ঘ রাত্রির মধ্যে রাখা যায়,—অর্থাৎ দিনের কিছু সময় অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক সৌরীন্দ্রমোহন সরকার টবের মধ্যে শীতকালের ধান রূপশাল গ্রীষ্মকালে ফলিয়েছিলেন টবগুলিকে সন্ধ্যা থেকে বেলা ১২ অবধি অন্ধকার ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে, অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে ১৮ ঘণ্টা রাত ও ৬ ঘণ্টা দিনের সৃষ্টি করে। তাছাড়া শীতের দেশের বেশ কিছু উদ্ভিদ আছে যারা গ্রীষ্মের অতি দীর্ঘদিন ও ছোট রাত পেলেই ফুল ফোটে, শীতের দেশের রাইশস্য তার মধ্যে অন্যতম। এই প্রবন্ধলেখকের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট থিসিসের গবেষণার বিষয়বস্তুই ছিল ঘোর শীতকালে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে ১৮ ঘণ্টা দিন ও ৬ ঘণ্টা রাতের সৃষ্টি করে রাই গাছে ফুল ফোটান এবং সেই সময় গাছের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন ও হরমোনের পরিমাণ জানা। এই বিষয়ে বহু গবেষণা হয়েছে, আজও হচ্ছে, কি মূল প্রশ্নের সঠিক ও সম্পূর্ণ উত্তর আজও পাওয়া যায় নি

পরিবেশের বিষাক্ত উদ্ভিদ

তারক মোহন দাস

আমাদের চারিপাশে যে সমস্ত গাছপালা রয়েছে তারা নানা ভাবে আমাদের উপকার করে থাকে,—একথা ...রা সকলেই জানি, কিন্তু তাদের মধ্যেই বেশ কিছু গাছ ...ে যাদের ফুলে, ফলে, পাতায় বা শেকড়ে,বিচিত্র বিপাক ...ার ফলে নানা রকম বিষ জমা হয়। গাছের মধ্যে কিছু গাছ ...ছে যাদের ফুল, ফল আমরা প্রায় প্রতিদিন ব্যবহার করছি ...ই ঐ সব গাছকে চিনে রাখা তাদের কোথায় বিষ আছে ...না এবং কিভাবে সেগুলি সাবধানে ব্যবহার করতে হবে ...া জেনে রাখা খুবই দরকার।

ইতিহাস থেকে জানা যায় নিছক হত্যার জন্যই এইসব বিষাক্ত গাছপালা পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই ব্যবহৃত হত। বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসকে বিষ দিয়ে হত্যা করবার সময় হেমলক বিষ পানে বাধ্য করা হয়েছিল। হেমলক গাছের পাতা ফুল, শেকড় সবটাই বিষাক্ত। এই গাছের সারা দেহে অ্যালকালয়েড কোনিন্ কনিড্রিন ও ফর্নিসিন সঞ্চিত হয়। পূর্বে গ্রীসদেশে যুদ্ধবন্দীদের এই বিষ দানে হত্যা করা হত। পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আগাছা হিসাবে এই গাছ প্রচুর হয় হেমলক গাছের একটি ছবি এখানে দেওয়া হল।

রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণকলি ফুলের ওপর একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকলির বীজ মোটেই সুন্দর নয়। এতে ট্রাইগোনেলিন নামে বিষাক্ত অ্যালকালয়েড আছে। কৃষ্ণকলির ফুল ও পাতার ছবি এখানে ছাপান হল। এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম মিরাবিলিস জালাপা। এর বীজ যেন কেউ ভুলেও মুখে না দেয়। আপেল ন্যাসপাতি, এপ্রিকট, প্লম ...তি নামী ও উপকারী ফল। আমরা সকলেই যথেষ্ট ...বহার করি. কিন্তু এদের বীজে অতি ভয়ঙ্কর সায়ানাইড ...তীয় বিষ জমা থাকে। একটি দুটি বীজ ভুল করে খেলে ...ান ক্ষতি হয় না কিন্তু একমুঠো আপেলের বীজ খেলে ...্যু অবধারিত। এদের ফলগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ। ...লা লেবু, বাতাবী লেবু ও পাতি লেবুর বীজও নিরাপদ ...। সাইট্রাস জাতীয় প্রত্যেক ফলের বীজই বিষাক্ত। পাতি ...ু খাবার সময় বীজগুলি যেন সমস্ত বাদ দেওয়া হয়। ...টুকে লাল ও কালো রঙে মেশান কুঁচ ফলের বীজগুলি অতি ...র দেখতে, কিন্তু এতে অতি মারাত্মক আব্রিন বিষ সঞ্চিত ...ক। একটি মাত্রবীজই একজন মানুষের মৃত্যুর পক্ষে ...ষ্ট। কুঁচ গাছের বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাব্রাস প্রেরাটোরিয়াস।

আমাদের দেশের সর্বত্র ল্যানটানা ক্যামেরা নামে একরকম ...গাছা প্রচুর হয়, এর বাংলা নাম জানা নেই, এখানে একটি ...ব ছাপান হল। এই ছবি দেখলে এই গাছটিকে সহজেই ...া যাবে। এই গাছের বীজে ল্যামটোডিন নামে এক অতি বিষাক্ত পলিসাইক্লিক টারপেনয়েড জমা হয় যা খেলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এই গাছে লাল, হলদে, সাদা ও গোলাপী রঙের ছোট থোকা থোকা ফুল হয়, দেখতে সুন্দর বলে অনেকে বেড়ার কাজেও আজকাল এই আগাছাটিকে ব্যবহার করছেন। কিন্তু এর ফলগুলি অতি মারাত্মক রকম বিষাক্ত অনেকেরই তা জানা নেই। এছাড়া শিউলি গাছের বীজ, ধুতরা গাছের ফল ও বীজ, কলকে ফুলের বীজ ফল ও গাছের আঠা অতি মারাত্মক রকম বিষাক্ত। করবী ফুলের সমস্ত গাছটাই বিষাক্ত তাদের দেহে ওলিয়ানড্রিন, ওলিয়ান ড্রোসাইড, নেরিওসাইড নামে অতি বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত থাকে। বিছুটি গাছ স্পর্শ করলেই গা-চুলকয় এদের পাতা ও কাণ্ডের সূচাল রোমের মধ্যে একরকম বিষাক্ত পদার্থ থাকে তা আমাদের গাত্রচর্মে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

ব্যাঙের ছাতা বা মাসরুম আমরা অনেকে খাই, কিন্তু বেশ কিছু প্রজাতির মাসরুম আছে যা অতি বিষাক্ত। চীন, জাপান, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রতিবছর বেশ কিছু মানুষের মৃত্যু হয় এই বিষাক্ত মাসরুম খেয়ে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে তার থেকে অনেক বেশী। এটা বলা হয় রঙীন মাসরুমগুলিই সবচেয়ে বিপদজনক, অথবা রান্না করবার সময় যাদের রঙ বদলায় বা ঝাঁঝাল গন্ধ নির্গত হয় তারা বিষাক্ত। কিন্তু এসব লক্ষণ না থাকলেও মাসরুম বিষাক্ত হতে পারে। তাই যাঁরা মাসরুম চেনেন বা বিশুদ্ধ মাসরুমের চাষ করেন তাদের কাছ থেকেই এটি সংগ্রহ করা উচিত। নিজেরা মাঠ ঘাট থেকে তুলে এনে রান্না করা মোটেই নিরাপদ নয়। এখানে একটি অতি ভয়ঙ্কর রকম বিষাক্ত মাসরুম অ্যানানিটা মৎসকারিয়ার ছবি ছাপা হল। এই মাসরুম রান্না করে খেলে মৃত্যু অবধারিত।

আর একটি বিষাক্ত খাদ্য বস্তু হল খেসারির ডাল। খেসারির ডালে বিটা অ্যামিনো প্রোপিওনাইট্রাইল নামে বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত থাকে যা নিয়মিত ভাবে খেলে মানুষের পক্ষাঘাত রোগ হয়। এই অসুখের ভয়ে জেনে শুনে কেউ এই ডাল খায় না। তাই দামে খুবই সস্তা, আর সেই জন্যই গরীব মানুষেরা এই ডাল খায়, তাদের মধ্যে অনেকে না জেনেই খায়। এটা বলা হয় খেসারির ডাল ভালকরে সিদ্ধ করে গরম জলটা ফেলে দিলে বিষটা অনেকটা কেটে যায়। কিন্তু এটা একটা গ্রহণ যোগ্য পরামর্শ নয়। অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষের জন্যে এই সব নিয়ম মানা খুবই শক্ত।

সবজী হিসাবে টোমাটো, আলু সম্পূর্ণ নিরাপদ, কিন্তু টোমাটো ও আলু গাছের পাতায় ও অন্যান্য সবুজ অংশে



মশলার রাজা গোলমরিচ

সন্দীপ সেন

সমস্ত মশলাই উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। এগুলি খাদ্যের সাথে যুক্ত হয়ে খাদ্যকে স্বাদযুক্ত, সুগন্ধী এবং পাচনের উপযোগী করে। যদিও অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার খাদ্যকে বিষাক্ত করে এবং সব মশলাই পুষ্টিকারক নয়।

গোলমরিচ (Black Pepper) যার বৈজ্ঞানিক নাম 'পিপার নাইগ্রাম লিনিয়াস' (Piper nigram Linn.) মশলার রাজা বললে অতিশয়োক্তি হয় না। ভারতবর্ষে এর ব্যবহার বহুকাল ধরেই হয়ে আসছে। বহু যুগ ধরেই সোম, সিল্ক এবং মূল্যবান রত্নাদির মতো গোলমরিচও একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে গোলমরিচকে কারুথা পন্নু (Karutha Ponnu) বা কালো সোনা বলে অভিহিত করা হয়।

গোলমরিচ বেরী জাতীয় শুকনো ফল। এর গাছ লতানো গুল্ম, যার কাণ্ডটি ক্রমশঃ মাধবীলতার মত কাঠল হয়ে পড়ে। পাতাগুলো ঘন সবুজ রং-এর ডিম্বাকৃতি। উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত বছরে 2500 সেন্টিমিটারের বেশি হয় এবং মাটিতে প্রচুর হিউমাস থাকে সেখানে এর ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। গোলমরিচ কুঞ্জে গাছের তিন বছর বয়স হলেই বেরীগুলির উৎপাদন শুরু হয় এবং গাছের সাত আট বছর বয়স থেকে পূর্ণমাত্রায় ফলন শুরু হয়। পঁচিশ বছর বয়স থেকেই গাছের ফলন কমতে শুরু করে। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত একটি গাছ বাঁচে। সবুজ বেরী জাতীয় ফলগুলিকে প্রখর সূর্যালোকে ছয় থেকে আটদিন শুকিয়ে কালো মরিচে পরিণত করা হয়।

এটা যদিও জানা কথা যে মশলাযুক্ত খাবার পুষ্টিগুণসম্পন্ন হয় না তবুও আশ্চর্য ব্যাপার এই যে গোলমরিচ-এর মধ্যে শতকরা এগার ভাগ প্রোটিন, যাদের অন্যতম হল লাইসিন, হিস্টিডিন এবং সিস্টেইন। অসংপৃক্ত ফ্যাটি চর্বিযুক্ত খাদ্যাংশ থাকে শতকরা দশ ভাগ। শতকরা ভাগ শর্করা জাতীয় খাদ্য থাকে স্টার্চ রূপে। গোলমরিচ চারশ ক্যালরি তাপশক্তি সরবরাহ করতে

খাদ্যে গোলমরিচ ব্যবহার করা হয় এর ঝাঁঝ এবং বিশিষ্ট গন্ধের জন্য। যা প্রচুর লালা নিঃসরণে ক'রে পাচনে সহায়তা করে। পিপারিন নামক উপস্থিতির জন্যই গোলমরিচ তীব্র ঝাঁঝাল

আয়ুর্বেদে ক্ষুধাবর্ধক, হজমকারক ঔষধের এবং ঔষধরূপে গোলমরিচের ব্যবহার সুবিদিত। ডায়েরিয়া এবং কলেরার ঔষধ প্রস্তুতেও গোলমরিচের করা হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের জারকরস নিঃসরণে মরিচ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। খাদ্য সংরক্ষক হিসেবেও ভূমিকা অগ্রগণ্য। টিনজাত খাদ্যে এর বহুল প্রচলিত। স্যুপ, চাটনী, সস-এর মধ্যেও ব্যবহার

পেঁপের বীজ অনেক সময় গোলমরিচের মধ্যে দেওয়া হয়। ইথানলের মধ্যে সন্দেহযুক্ত দানাগুলো পেঁপে বীজগুলো ভেসে উঠবে। তাছাড়া উচ্চক্ষমতা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে গোলমরিচের স্টার্চ পরীক্ষা করে আসল ধরা হয়।

কেরালায় প্রতি একরে দশ হাজার কেজি গোলমরিচের মত কুঞ্জ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ বৎসরে দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা মুদ্রা উপার্জন করে গোলমরিচ রপ্তানি করে।

1/4, বারোয়ারীতলা রোড, বেলেঘাটা, কলি-10

গাছপালার গল্প   অরবিন্দ ঘোষ

পাগলা গাছ

মানুষ আর জীবজন্তু যেমন পাগল হয় তেমনি গাছও পাগল হয় কিনা জানা নেই, তবে এই গাছটির খামখেয়ালীপনা চরিত্রের জন্য এর নাম হয়েছে পাগলা গাছ এবং ইংরেজিতে এর নাম ম্যাড্‌ট্রি। পাগলাগাছের পোষাকীনাম স্টারকুলিয়া এ্যালাটা · ভ্যারাইটি-ডাইভার-সিফলিয়া। স্টারকুলিয়েসী পরিবারভুক্ত এই বৃক্ষের আদি জন্মস্থান ভারত ও বর্মার উষ্ণাঞ্চলে। পৃথিবীতে স্টার-কুলিয়াগণের প্রায় 100টি প্রজাতি রয়েছে তাদের বেশিভাগেরই উৎপত্তিস্থল এশিয়া-মহাদেশের উষ্ণাঞ্চলে। ভারতে এদের 8—10 টি প্রজাতি রয়েছে তারমধ্যে কিছু-প্রজাতি সরলাকৃতি কাঠের জন্য জঙ্গলে চাষ করা হয়। এ গাছের উচ্চতা প্রায় 80—100 ফুট পর্যন্ত হয়, বেশি উঁচু হওয়ার জন্য শকুনেরা গাছে বাসা বাঁধে। পাগলাগাছের পাগলামীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—এর প্রত্যেকটি পাতা বিভিন্ন আকৃতির অর্থাৎ একটি পাতার আকৃতির সঙ্গে অন্য কোন পাতার মিল নেই। সেগুনপাতার মতো বড় চওড়া পাতার কিনার বিভিন্ন আকৃতির খাঁজকাটা, বড় অদ্ভুত ধরনের। পাগলাগাছের এই অদ্ভুত চরিত্রের জন্য এরা উদ্ভিদপ্রেমিকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় ও মনে কৌতূহল জাগায়। একে সচরাচর দেখা যায় না তাই দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদও বলা চলে। সমভূমির উষ্ণাঞ্চলের প্রায় সব রকম মাটিতেই একে চাষ করা চলে, সাধারণত [illegible] থেকে চারা তৈরি করা হয়। ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে থোকা থোকা ক্ষুদ্রাকার ফুল ফোটে পরে পাতা [illegible] পড়ে এবং পুনরায় নতুন পাতা গজায়। কলকাতার [illegible] হর্টিকালচার বাগানে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়।



পাগলা গাছ

উদ্যান ও কানন শাখা, কোচবিহার।

জীবাশ্ম উদ্ভিদ

জীবন্ত জীবাশ্ম উদ্ভিদ কথাটা শুনে মনে কিরকম একটা খটকা জাগে, মনে হয়—সেটা আবার কি! জীবাশ্ম বা ফসিল-তো কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর পাথরে রূপান্তরিত নাম, সেই পাথর কি কখনও জীবন্ত হয়? কিন্তু হ্যাঁ? কখনও কখনও হয়েছে আর সেই-জন্যেই তো খবরটা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর এবং উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ-দের কাছে এনে দিয়েছে এক নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

দার্জিলিং বোটানিক গার্ডেনে রোপণ করা হয়েছে এক শ্রেণীর বৃক্ষ যার নাম—মেটাসিকুয়া এবং এটাই হ'ল জীবন্ত জীবাশ্ম উদ্ভিদ। ট্যাক্সোডিয়েসী পরিবারভুক্ত এই বৃক্ষটির বৈজ্ঞানিক নাম—মেটাসিকুয়া গ্লিপটোসট্রোবয়েডস্ এবং এটাই হ'ল মেটাসিকুয়াগণের একমাত্র প্রজাতি। চীনদেশের অধিবাসী এই বৃক্ষের এদেশে প্রথম পরিচিতি ঘটে দার্জিলিং বোটানিক গার্ডেনের মাধ্যমে প্রায় 22 বছর আগে। ঠাণ্ডা জলবায়ুর উপযোগী এই বৃক্ষের পছন্দ 5—15° সে.গ্রে. তাপমাত্রা এবং আদ্রপরিবেশ। হালকা দোঁয়াস মাটি [illegible] পছন্দ করলেও প্রায় সব ধরনের পাহাড়ী মাটিতে [illegible] থাকতে পারে।

মেটাসিকুয়া বৃক্ষ ও পাতা দেখতে এদেশের তেঁতুল [illegible] বাবলা গাছের মতো। উপযুক্ত পরিবেশে 115 ফুট উ[illegible] হ'লেও এদেশে 30-40 ফুটের বেশি দীর্ঘ হয় না। [illegible] গুঁড়ি লালচে বা তামাটে রঙের এবড়ো-খেবড়ো শক্ত মজ[illegible] গড়ন বেশ মনোরম। চিরুণীর মতো সজ্জিত [illegible] সবুজপাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, লম্বায় অর্ধ ইঞ্চি, সূক্ষ্মাগ্র, রেখা[illegible] শীতে পাতা ঝরে পড়ে। বীজ থেকে বংশবৃদ্ধি হ[illegible] এদেশে এখনও বীজ দেখা যায়নি তবে সহজেই গুটি[illegible] দ্বারা বংশবিস্তার করা যায়।

এই চমকপ্রদ জীবনেতিহাস সর্বস্তরের উদ্ভিদপ্রেমি[illegible] কাছে এক অভিনব ঘটনা হয়ে রয়ে গেছে। তবে 1941 [illegible] বৃক্ষটি আবিষ্কৃত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন শীতোষ্ণ অঞ্চ[illegible] বোটানিক গার্ডেনে এই দুষ্পাপ্য বৃক্ষটির চাষ করা হয়ে[illegible]



আন্দামানের ম্যানগ্রোভ

তপন আদক

…বুজ দ্বীপ আন্দামান। দ্বীপমালার উপর দিয়ে
আকাশ পথে যেতে যেতে নিচের দিকে তাকালে মনে
…সবুজ সবুজ কয়েকটা ঢিবি যেন সাগরের নীল জলে
…। দ্বীপপুঞ্জের সবুজ বনানীর শুরু একেবারেই
…লের গা ঘেঁসে। জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করার সময়ে
…দাঁড়ালে চোখে পড়বে অগভীর জলের উপর গা ঘেসা-
…করে দাঁড়িয়ে আছে চিরহরিত বন। আন্দামানের
…সব উপকূলবর্তী অঞ্চলে কিংবা যে সমস্ত সমুদ্রখাঁড়ি
…ভিতরে বেশ কিছুটা ঢুকে গেছে সে সব খাঁড়ির দু
…ই দেখা যাবে নোনা জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য
…। এ সব গাছগুলোর নাম ম্যানগ্রোভ।
গাছেদের বংশ বিস্তার হয় বীজ, শিকড়, পাতা কিংবা
…থেকে। ফলফুলের গাছের কৃত্রিমভাবেও বংশ বিস্তার
…। কলম (কাটিং) এর অভিনব কৌশলে তো আজকাল
…ই গাছে আম আর আতা ফলতে পারে। সুকুমার রায়ের
…ায় এ গাছের নাম 'আমতা' রাখলে ক্ষতি কি ? কিন্তু
…নগ্রোভ গাছের বংশবৃদ্ধি রীতির মধ্যে একটা বিশেষত্ব
…। গাছে লম্বা লম্বা লাঠির মতো ফল ঝুলতে থাকে।
…জের লুপ্ত অবস্থা বলে কিছু নেই। ফলটি বা বীজটি

গাছেই অঙ্কুরিত হয়ে যায়। ফলের ডগার দিকটি শক্ত ও
সূচালো হয়। সুপক্ক হয়ে গেলে টুপ করে ফলটি পড়ে যায়
লম্বভাবে। নিচে কর্দমাক্ত মাটি থাকায় ফলের সূঁচালো
প্রান্তটি কাদায় গেঁথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার থেকে
নতুন গাছ জন্ম নেয়। লম্বা লাঠির মতো ফলটি পরিণত
হয় গাছে। দোদুল্যমান ফলগুলি যদি জোয়ারের সময়
জলে পড়ে তাহলে ফলগুলি ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যায়।
সমুদ্রের নোনা জলে ফলটি বহুদিন পর্যন্ত না পচে ভেসে
থাকতে পারে। ভাসতে ভাসতে ফলের নিমজ্জমান প্রান্তটি
যখন উপকূলের কাছাকাছি কাদামাটির স্পর্শ পায় তখন সে
জায়গায় অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সেটি শিকড় বিস্তার করতে
থাকে। এভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে ম্যানগ্রোভের বংশ
বিস্তার হয়ে থাকে। গাছ একটু বড় হলে গাছের কাণ্ড
থেকে অসংখ্য শিকড় বটের ঝুরির মতো নিচের দিকে নেমে
এসে কাদামাটিতে প্রোথিত হয়। এ ধরনের শিকড়গুলো
ধনুকের মতো বাঁকা বাঁকা হয়। এ শিকড়গুলি জোয়ারের
স্রোত এবং ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে গাছগুলোকে রক্ষা করে। কারণ
শিকড়গুলো গাছকে মাটির সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে
রাখে। লাল ম্যানগ্রোভ বেশ গভীর জলেও জন্মাতে



শাল গাছ

সুজিত মুখোপাধ্যায়

কাষ্ঠশিল্পের অন্যতম উপাদান, অবশ্যই মূল্যবান শাল হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হয়। দেরাদুন, কুমায়ুন, আসাম, ছোট-নাগপুর ও উড়িষ্যা প্রভৃতি জায়গায় ব্যাপক শাল বনাঞ্চল দেখা যায়। নেপালেও প্রচুর শালবন আছে। এই সমস্ত স্থানের আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও সাধারণভাবে বালি যুক্ত মাটি, মোটামুটি 12 600 সেমি বৃষ্টিপাত অঞ্চল এবং 22°—30°C তাপ সম্পন্ন পরিবেশ শাল উৎপাদনের পক্ষে আদর্শ।

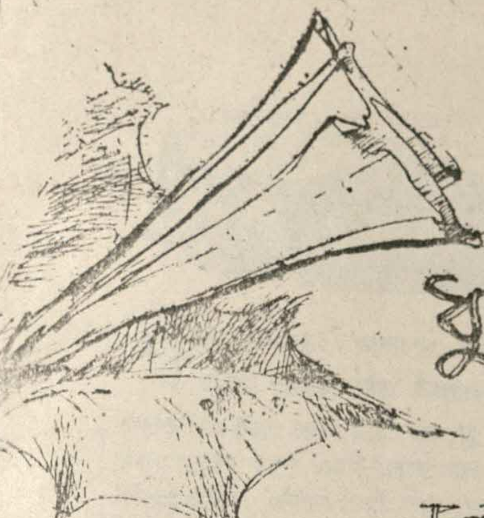
শোরিয়া রোবাস্টা (Shorea robusta) উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পরিচিত এই গাছটি ডিপ্টেরো কার্প (Diptero Carpaceae) গোত্রভুক্ত দীর্ঘাকার বৃক্ষ সরল, স্টিপিউল যুক্ত এবং এর পুষ্পবিন্যাস সা জাতীয়। ফল আবার সামারয়েড প্রকৃতির। শাল ছাল মসৃন ও সাদা। কাষ্ঠল অংশটা অনেকটা বর্ণের এবং রন্ধ্র যুক্ত।

শালের বীজ থেকেই বংশবিস্তার হয় অর্থাৎ বনাঞ্চল গঠিত হয়। মাটি ভালভাবে নরম এবং করার পর ওতে সারিবদ্ধ ভাবে গভীর গর্ত করা বর্ষার সমাগমে শাল বীজ ঐ স্থানগুলোতে বপন পরে নির্দিষ্ট সময় কাল পর্যন্ত জলসেচন ও উৎপাটন করা হয়। বীজ খুব তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত বীজ থেকে অঙ্কুরিত, 2—5 সেমি উচ্চতা সম্পন্ন বীজতলায় রাখবার পর বন সৃষ্টির জায়গায় গর্ত লাগান হয়। এই সময় শাল গাছকে রক্ষার জন্য যুক্ত উদ্ভিদ (Supporting Plants) লাগান হয়। উদ্ভিদগুলো অতিরিক্ত তাপ থেকে শালকে রক্ষা জন্য ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে। মাটিতে যাতে জমতে না পারে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। 30—40 সেমি উচ্চতাসম্পন্ন এবং 6—7 মিটার পরি হলে প্রয়োজন মত ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে।

শাল উদ্ভিদটি হার্ডউড গুণসম্পন্ন। খুঁটি, রেলপথের স্লীপার, সেতু নির্মাণ কার্য প্রভৃতিতে প্রচুর ব্যবহার হয়। এছাড়া বাড়ির বিভিন্ন আস নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণেও শাল কাঠের ব্যবহার দেখা যায়।

99, মহারাজা নন্দকুমার রোড (নর্থ), কল-35





ধুতুরা গাছের গুণাগুণ

চন্দনকুমার দাস

...হ নামটার সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত। যদিও ...র লোকেরা হয়ত ধুতুরা গাছ চেনে না, অনেকেই ...এ নামটিই শোনেনি। কিন্তু পল্লীগ্রামে ছেলে ...পর্যন্ত সবাই চেনে। ধুতুরা গাছ সাধারণত 2 ফুট ...টের মত উঁচু হয়। ধুতুরা ফুল দুরকম—সাদা ... আমাদের দেশে সাধারণত হলদে ফুলওয়ালা ...খুবই কম জন্মে। সেই তুলনায় সাদাফুলওয়ালা ...আমরা অধিক পরিমাণে দেখতে পাই। ধুতুরা ...লের মত দেখতে। এক মাথা সরু নলের মত ...র মাথা চ্যাপ্টা হয়। পাতাগুলি লম্বা, পাতার ...জ বিশিষ্ট। ধুতুরা ফল গোল হয়। এক একটি ...ন 150 গ্রাম থেকে 200 গ্রাম পর্যন্ত হতে ...ফলগুলির গায়ে অসংখ্য কাঁটা দেখা যায়। ফলটি ...লে—ফেটে বীজগুলি বেরিয়ে যায়।

... গাছের ইংরেজী নাম—ডেভিলাস ট্রামপেট বা ...জ্ঞানিক নাম আবার দুটি। যথা—Devilas ...te (i) ডেটুরা ফ্যাস্টুয়েসা-বা Datura Fastuosa ...টুরা স্ট্রামোনিয়াম বা Datura Stramonium ...নের গাছ সোলন্যাসিবা বার্তাকু বা Coelnasiva ... গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

...ছ যেখানে সেখানে—যত্নে অযত্নেই জন্মে। ...য় যে সকল স্থানে গোবর জড়ো করা থাকে—তার ...ইগাছ বেশী জন্মে। তাছাড়া অন্য জোড়ালো মাটিতেও ...ছ জন্মে। এই গাছের কাণ্ড খুব ছোট হয়।

...রা ফুলের গন্ধ না থাকলেও ইহা আমাদের অনেক কাজে লাগে। নীচে বর্ণনা করা হল। (1) কারও যদি খুবই সর্দি লাগে এবং সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে—অথবা নিঃশ্বাস ফেলতে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে ধুতুরা ফলকে শুকিয়ে ইহা হুঁকোয় ভরে ধূমপান করলে আরাম পাওয়া যায়।

(2) কোন কারণে যদি শরীরের কোন জায়গা ফুলে যায় বা পড়ে গিয়ে ব্যথা করে—তাহলে ধুতুরা পাতার রস বার করে ঐ স্থানে প্রলেপ করলে বেদনা কমে যায়।

(3) কারো যদি দাঁতের গোঁড়া বা কানের গোঁড়া ফুলে গিয়ে বেদনা করে, তাহলে চার ভাগ ধুতুরা পাতার রসের সঙ্গে এক ভাগ আফিং মিশিয়ে লাগালে বেদনা কমে।

(4) কারো যদি ফোঁড়া হয় এবং দীর্ঘদিন ভাল না হয়। তাহলে সাত ভাগ ধুতুরা পাতার রসের সঙ্গে এক ভাগ ঘি মিশিয়ে ফোঁড়ায় লাগালে ফোঁড়া তাড়াতাড়ি পেকে যায় এবং ফেটে যায়।

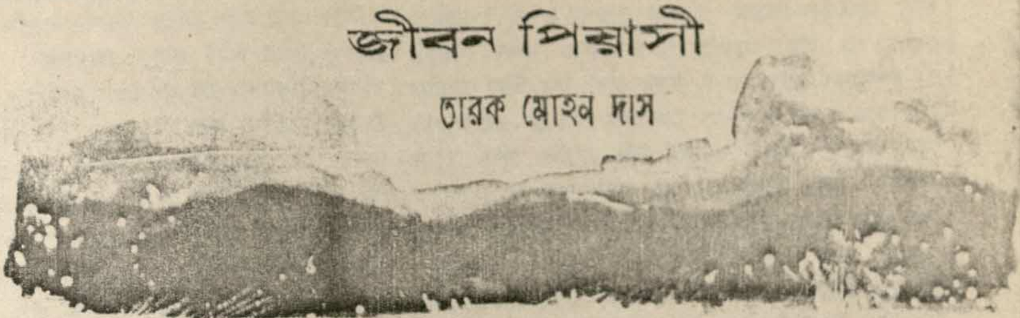
(5) কোন বাচ্চার বা বড় মানুষের পেটে যদি অত্যন্ত কৃমি থাকে তাহলে 1টা বা 2টা (বাচ্চাদের জন্য) এবং 2টি বা 4টি (বড়দের জন্য) ধুতুরা পাতার রস ঘোল-এর সহিত মিশিয়ে খাওয়ালে কৃমি নষ্ট হয়ে যায়।

(6) কারো যদি খাবার হজম না হয় অর্থাৎ বদহজম হয়—তাহলে $\frac{1}{2}$ টা থেকে (বাচ্চাদের জন্য) বা 1টা থেকে 2টা (বড়দের জন্য) ধুতুরা ফলের বীজকে শুকিয়ে গুঁড়ো করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে খাওয়ালে হজম হয়।

উপরে লিখিত ছটি উপকারই ধুতুরা গাছের দ্বারা হয়। কিন্তু আগেই বলেছি ধুতুরা গাছ বিষাক্ত কাজেই ব্যবহার করবার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাত্রা অধিক না হয়।

জীবন পিয়াসী

তারক মোহন দাস



শীতের অপরাহ্ন। আকাশের লাল, নরম আলোটুকু ছড়িয়ে পড়েছে পার্বত্য উপত্যকার বুকে। পেছনে পাহাড় ধাপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠে গেছে বহু ঊর্ধ্বে। কয়েকটি বাবলা গাছের পাশে একটি বাদাম গাছ সুউচ্চ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একদল পাখী তুমুল কলবর করতে করতে তার মাথার ওপর এসে বসল। একটি সবুজ ফল বাদামের সবচেয়ে উঁচু ডাল থেকে ঝরে পড়ল, পাতায় পাতায় ছট্-ছট্ শব্দ করতে করতে নীচের দিকে পড়তে লাগল, তারপর মাটির ওপর পড়ে বেশ খানিকদূরে এগিয়ে গেল ফলটি— শেষে একটি শক্ত ঘাসের শীষে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল কাত হয়ে। একটি কাঠবিড়ালি সেই শব্দ শুনতে পেয়ে শশব্যস্তে মুখ তুলে পাতার ফাঁক দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। গভীর সবুজ রঙের ফলটি ওপর থেকে ফ্যাকাশে ঘাসগুলি থেকে বেশ পৃথক ভাবেই দেখা যাচ্ছে। কাঠ-বিড়ালিটি তখনি লাফাতে লাফাতে নামতে লাগল এ ডাল ও ডাল বেয়ে বেয়ে। মাটিতে নেমে একটু ইতস্ততঃ করে, তারপর দৌড়ে গিয়ে ফলটিকে অধিকার করে। মুখ তুলে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সামনের দুপায়ে করে ফলটি মুখের কাছে তুলে খেতে শুরু করে দেয়। ফলটি বেশ বড় আর শক্ত, তার ধারগুলি একটু একটু খেয়ে আবার চলে এল তার নিজস্ব ডালটায় যেখানে তার কোটর আছে।

অতিদূর থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসে বাতাসে। পাহাড়ের বুক থেকে একটা বিরাট, কালো আর পাতলা চাদর ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে নীচের দিকে উপত্যকার কোলে। পাহাড়ের বুকে শীতঋতুর উৎসব সুরু হয়ে গেছে এ-তারই আভাষ। বিরাট একপাল পাহাড়ী মৌমাছি শীতরিক্ত অরণ্য ত্যাগ করে উপত্যকার কোলে নেমে আসছে উত্তাপের সন্ধানে, বাতাস কাঁপছে তাদেরই পাখার আঘাতে। ঘুঘু বন্য পারাবত বাসায় ফিরছিল, তারা ঈষৎ দিক পরিবর্তন করে নিল, পথ ছেড়ে দিল পাহাড়ী মৌমাছিদের। কাঠবিড়ালিটি পাতার ছায়ার বাইরে এসে একটু নরম আর মিষ্টি রোদের মধ্যে বসল। আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে, সেখানে কি যেন খুঁজল! তারপর আবার ডুব দিল পাতার ছায়... আঁকা রোদের মধ্য দিয়ে আরও ওপরের দিকে যে... শীতের বিকেলটি তখনও উত্তাপ দিচ্ছিল মৃদু মৃদু। মৌম... দল নেমে এল শাল, মহুয়া, অর্জুন, বাবলা, আমলকী... বাদামের অরণ্যে। দল ছেড়ে একটি রাণী মৌমাছি... বসল সেই বাদামেরই একটি পাতায়, সূর্যের আলোয়... চক চক্ করছিল করছিল, কাঠবিড়ালিটি যার কাছে... দিন পৌঁছুতে পারে নি। সঙ্গে সঙ্গে একপাল মৌ... দল ছেড়ে তার পেছনে পেছনে চলে এল, ব্যস্ত ভাবে ... পাকাতে লাগল তাকে ঘিরে ঘিরে বহুক্ষণ ধরে। ... সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ছড়িয়ে পড়ল সেই পাতাটির ওপর, ... হতে আরম্ভ করে সমস্ত ফলকটিকেই গ্রাস করে ... সন্ধ্যার ধূসর আর ঠাণ্ডা অন্ধকার। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে... কাঠবিড়ালিটি তার কোটরের কাছে ফিরে এল, প্র... করতে লাগল তার সঙ্গীর জন্য একটু পরেই তার স... ফিরে এল ছুটতে ছুটতে তার দিকে। মৌমাছিরা অন্ধ... নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইল বাদামের ডালে। শুধু সদ্য জাগ... বাদুড়ের দল পাখা মেলে দিল আকাশে, আর যে সব... রাত্রে ফোটে, যাদের খুব উগ্র গন্ধ আর সাদা রং ... পাপড়ি খোলবার আয়োজন করতে লাগল।

পরদিন ভোর না হতেই কাক, শালিক, ময়না, ... আর কাঠবিড়ালিটি দেখল বাদাম গাছের ডালেই আ... একদল মৌমাছি উপনিবেশ স্থাপনের কাজ সুরু ... দিয়েছে। সকলেই শুনল তাদের পাখার শব্দ, স... দেখল তাদের যাওয়া আসা কিন্তু কেউ কিছু বাধা দিল... শুধু একদল ছোট কালো পিঁপড়ে যাদের বাসা ছিল কাছাকাছি তারা সমস্ত ডিম আর শীতের সঞ্চিত খাদ্য... করে নিয়ে প্রস্থান করল নীচের একটা ডালে। একটা মাকড়সা মৌমাছিদের উপনিবেশের কাছাকাছি একটা জাল তৈরী করে ফেলল সারাদিনের প্রচেষ্টায়।

ধীরে ধীরে কয়েকটি পক্ষ অতীত হল। চাঁদ দিন... সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে আকাশে। মৌমাছিদের উপনি... পূর্ণ হয়ে উঠছে মধুভারে, অতি পরিষ্কার কক্ষগুলি, ছা...

…ফুলের মধুতে স্ফীত, প্রসারিত হয়ে উঠেছে তার ছ'কোনা …ওয়ালগুলি। শীতও এদিকে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে …তাকার বুকে। বাদামের তলায় রাশি রাশি শুকনো …তা জড়ো হচ্ছে। সেদিন অপরাহ্নের আলোয় একটি মৌমাছি …ভ পাখা কাঁপিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল ছাতিমের আবর্ত …র মাঝে, বসছিল না কোথাও, একটিও ফুল নেই, কোন …ও নেই, কোন সম্ভাবনাও নেই,—বিশুষ্ক ফুলের স্তবকগুলি … পাকান বাদামী সূতার মত পল্লবের প্রান্তে দুলছিল …বার প্রতীক্ষায়। ঘাসের ওপর মহুয়া, শাল, হরিতকী ও …লের তির্যক্ ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে, তার ওপর দিয়ে …মাছিটি নাচতে নাচতে ভেসে চলল, তার পাখায় শীতের …মের একটুও জড়তা বিস্তার করতে পারে নি। হঠাৎ …মাছিই স্তব্ধ ভাবে উড়তে থাকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে …ড়িয়ে। এক সারি হিজলের তলায় একটি ছোট গাছ—

…র পাতার প্রান্তে বিকেলের রৌদ্র আঁকা একটা ফুলের মত …দুলছে! মৌমাছিটি নিমেষে আসে আর কাছে, ক্ষিপ্র …তে প্রদক্ষিণ করে গাছটিকে বার বার, সে যে অত্যন্ত …রেজিত হয়েছে সেটা তার পাখার বর্ধিত কম্পন লক্ষ্য …লেই বোঝা যায়। গাছের পাতাগুলি অতি মনোরম, …সের মত দেখতে, যার মুখে একটি ঢাকনি রয়েছে আধ …লা অবস্থায়। এমন বিচিত্র কলস থেকে কখনও সে মধু …হ করে নি। মৌমাছিটি তার বৃত্তের পরিধি সংক্ষিপ্ততর …রে আনে। মধুর চেনা গন্ধে চটুল হয়ে ওঠে তার ওড়ার …। মৌমাছিটি তবু সেই মুহূর্তেই স্পর্শ করতে চায় না …টিকে, সম্ভাব্য ক্ষিপ্রতম বৃত্তে প্রদক্ষিণ করতে থাকে বার …, যেন পাকে পাকে তার মধু পিপাসাকে পরিপক্ক করে …তে চায়। শীতের বাতাসে গাছটি 'একটু দুলে ওঠে, এবং … প্রথম স্পর্শ করে মৌমাছিটিতে। চক্ষের নিমেষে …মাছিটি উঠে পড়ে গাছটির ওপর। কলসের কিনারা …র সড় সড় করে আনাগোনা করতে থাকে আর মধুপান …তে থাকে বিভোর আগ্রহে। তার পাতলা দু জোড়া …খা স্পন্দিত হতে থাকে ঘন ঘন, ওড়ে না কিন্তু একটুও। …রের আলো বেশ স্পষ্ট ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে কলসের …তর, বেশ মসৃণ ভেতরটা, যেন কৌতুক ভরে ইচ্ছে করেই …জেকে সে নিক্ষেপ করে তার মধ্যে—একরাশ কেশরের মত … বাঁকা শুঁয়ার ওপর। একটি মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই …বার জন্মকালের অভ্যাস মত পাখা নেড়ে পরাগ রেণু …রদিকে ছড়িয়ে উঠে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোথায় …গরেণু? একটা বিশ্রী, চটচটে পদার্থ তার পা গুলিতে …গে গেছে। মুখে করে একটু তার স্বাদ গ্রহণ করে, সঙ্গে …ই তার কণ্ঠনালীতে আগুন ধরে যায়, ছট্‌ফট্ করে ওঠে … যন্ত্রণায়, উদ্গীরণ করে ফেলে যত মধু খেয়েছিল সব— …বার। কিন্তু তবুও যন্ত্রণার কিছুমাত্র উপশম হয় না। সে প্রাণপনে চেষ্টা করে সেই স্থান ত্যাগ করে পালিয়ে আসবার। কিন্তু কোথায় যাবে? সাপের মত ফণা তুলে একরাশ কেশর মাথার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে বেরিয়ে আসবার যতই চেষ্টা করে ততই বাধা পেয়ে নিমজ্জিত হয় আগুনে ভরা রসে। পেছনের পা গুলো জ্বালা করে তীব্র ভাবে দুপুর রৌদ্রের সময় উড়তে উড়তে পাথরের ওপর বসলে পা যত জ্বালা করে তার চেয়ে অনেক বেশী। ব্যাকুল-ভাবে সে চারিদিকে পথ খোঁজবার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ হয়। হঠাৎ তার নজরে পড়ে সদ্য মৃত একটি মৌমাছি পড়ে রয়েছে একপাশে, দূরে আরো কয়েকটি মৃতদেহ, যাদের পাখাগুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে আর সবই হজম করে ফেলেছে এই উদ্ভিদটি। সে কোনমতে একটি মৃত মৌমাছির দেহের ওপর উঠে পড়ল এবং সেখান থেকে আরো ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল।

ওদিকে আকাশ থেকে ধীরে ধীরে নীল সন্ধ্যা নেমে আসে। সেদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গোটা চাঁদখানাই আকাশে উঠল। পূর্ণিমা তিথি। সে আলো মৌমাছিটির চোখে এসে পৌঁছাল না। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মৌমাছিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। অন্ধ হয়ে চুপ করে বসে রইল মৃত পতঙ্গটির দেহের ওপর, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে, তার যেন আর কিছুই করবার নেই শুধু যন্ত্রণা অনুভব করা ছাড়া।

তখন সম্ভবতঃ মধ্যরাত্রি। মৌমাছিটি আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। পূর্ণচন্দ্রের নীল উজ্জ্বল আলো সরল ভাবে এসে পড়েছে তার পুঞ্জাক্ষির ওপর, সে ফিরে পেল আবার তার কর্মপ্রেরণাকে। ওপর দিকে তাকাল, উঠে আসবার আবার চেষ্টা করতে লাগল পাখা কাঁপিয়ে। মাথার ওপর দীর্ঘ বক্র কেশরের জাল, তার মধ্য দিয়ে পূর্ণচন্দ্রের সম্পূর্ণ অংশটাই দেখা যাচ্ছে—যেন পূর্ণচন্দ্র নিজেই কারাগারে বন্দী হয়ে উঁকি মারছে লোহার গারদের ফাঁক দিয়ে! মৌমাছিটি নড়াচড়া করে ওঠে, অত্যন্ত পিপাসা পায়, চাঁদিনী রাতের মধু পিপাসা। এই সময় ওরা উন্মাদ হয়ে চাক ভেঙ্গে নিঃশেষে খেয়ে ফেলে সকল মধু। চাঁদের উজ্জ্বল নীল আর নরম আলো যখন তার চোখের ওপর এসে পড়ে তখন অসহায় ভাবে মৌমাছিটি শুধু হাঁপাতে থাকে দেহের পশ্চাদ্ ভাগ স্পন্দিত করে। আবার যখন মেঘ এসে ছায়া ফেলে, অথবা নৈশ বাতাসে চন্দ্রমুখী কলসটি দোল খায়—অন্যদিকে মুখ ফেরার তখনই তার চোখে নামে আঁধার, আতপ্ত চেতনায় নামে সুপ্তি। ঠাণ্ডা রাতের হিম জমাট বেঁধে জলের ধারায় গড়িয়ে পড়ে কলসের গাত্র বেয়ে বেয়ে, কেশর বেয়ে বেয়ে ক্লিষ্ট মৌমাছিটির মাথার ওপর—যা তার অন্তর ও বাহিরের দহনের কিছু করে উপশম। ক্রমে চন্দ্র বিদায় নেয়। রাত্রি অবশেষে শেষ হয়ে আসে। মৌমাছিটির জীবন লীলা কিন্তু তখনও সাঙ্গ হয় না। পায়ের তলাকার মৃত পতঙ্গটি এর

মধ্যেই অনেকটা জীর্ণ হয়ে এসেছে, এইবার সম্ভবতঃ মৌমাছিটি নিমজ্জিত হবে সেই রসে। তার পায়ের লোমগুলি খসে গেছে সারারাতে, এইবার তার ছয়খানি পা জীর্ণ হতে থাকবে, তারপর বক্ষ, শেষে চোখ দুটি—বহু চোখের সমন্বয়ে যায় সৃষ্টি। তার সমস্তই নিঃশেষে হজম করে ফেলবে এই উদ্ভিদটি।

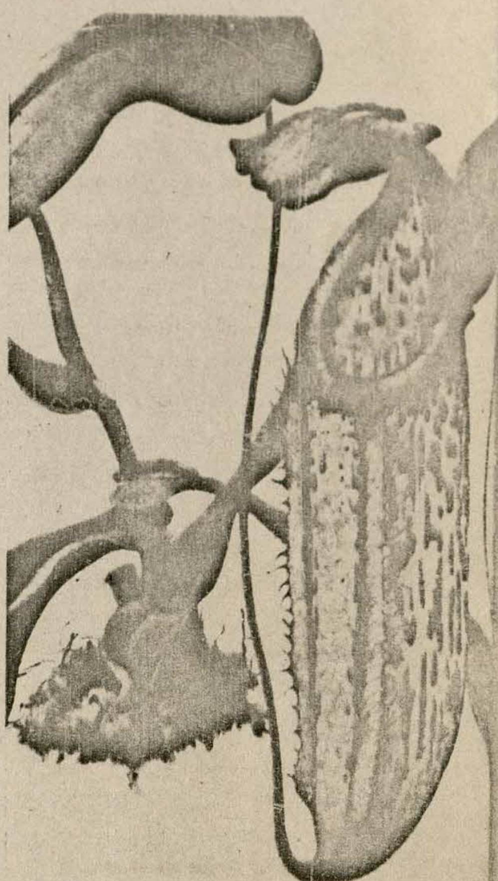
মৌমাছিটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে যায়। উদ্ভিদটিই প্রাণ হারায় একটি স্বাভাবিক দুর্ঘটনায়। সম্ভবতঃ নিকটবর্তী গ্রাম থেকে একদল মেষ সেদিন মধ্যাহ্নে হিজলের তলায় এসে বিশ্রাম করছিল। ছোট সবুজ গাছটি দেখতে পেয়েই একটি মেষ চিবোতে সুরু করে দিল পাতাগুলি। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। মৌমাছিটি ছিটকে পড়ল ঠাণ্ডা ঘাসের ওপর। আকস্মিক ঘটনার প্রথম মুহূর্তগুলি সম্পূর্ণ অনুভূতি শূন্য। মৌমাছিটি চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়ে রইল ঠাণ্ডা ঘাসের ওপর, তারপর সরু শীষ বেয়ে বেয়ে ওপর দিকে উঠতে লাগল, ওপরটা আরও একটু বেশী গরম। তারপর ধীরে ধীরে ভেসে চলল ক্লান্ত পাখায় ভর করে আপন উপনিবেশের দিকে।

কিন্তু কোথায় তার সেই গুঞ্জন ভরা উপনিবেশ। একটি মৌমাছিও কোথাও নেই। কাল মধু-পূর্ণিমাতে সকল মৌচাক ভেঙ্গে নিঃশেষে মধু খেয়ে যাযাবরের দল চলে গেছে শীতের অরণ্য ছেড়ে আরও নীচে বসন্তের সন্ধানে। নীরব শূন্য চাকটি বাদামের ডালে ঝুলছে। দূরে মাকড়সার জালটি তেমনি ভাবেই পাতা রয়েছে, নিষ্কর্মা মাকড়সাটি তার মাঝে চুপ করে বসে বসে বিশ্রাম করছে। কাঠ বিড়ালিটি ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করে খেলা করছে তার সঙ্গীর সংগে। একটি বাদামের পাতার ওপর মৌমাছিটি গিয়ে বসল—শূন্য চাকটির যেটি সবচেয়ে কাছাকাছি। অত্যন্ত শুষ্ক আর বিবর্ণ দেখাচ্ছে চাকটি, কেমন সব কিছুই শূন্য, সারাদিনের বাতাসে অনেক ধূলা এসে জমেছে তার ছ কোণা ঘরগুলিতে। দু একটি কাল পিঁপড়ে ঘোরাঘুরি করছে এদিক ওদিক। মৌমাছিটি আবার আকাশে ভাসল, উড়ে গিয়ে বসল একটি আমলকীর ডালে। যেখানে কোন ফুল নেই, পাতাও নেই; তারও আজ যেন সকল কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, সকল কর্ম প্রেরণাও ফুরিয়ে গেছে। সে অল্প পরেই আবার ফিরে এল বাদামের পাতাটির ওপর। আকাশের দিকে শান্ত দৃষ্টি মেলে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল মাকড়সাটির চাইতে অনেক বেশী শান্ত হয়ে। যেন উপসনার নিমগ্নতা এসেছে তার চেতনায়।

সে রাত্রে শীত পড়ল তীব্রতম। ঠাণ্ডা বাতাস নিদারুণ ভাবে বইতে লাগল। চাঁদের জ্যোৎস্না তুষারের মত শুভ্র আসন বিছিয়ে দিল। ঘুমন্ত প্রকৃতির বুকের ওপর। কাঠবিড়ালিটি আপন কোটরের মধ্যে তার সংগীর নরম পিঠের ওপর নিবিড় ভাবে মুখ রেখে ঘুমোতে লাগল,—পর... দেহ তাপের একটা আরামদায়ক গন্ধভরা আচ্ছাদনী ... করে। মৌমাছিটি ঠিক একই ভাবে বসে রইল সারা... ধরে ঠাণ্ডা পাতাটির ওপর। একটুও উত্তাপের সন্ধান ... না কোন আচ্ছাদনের তলায় অথবা নিজের অংগ স... করে। অরণ্যের বাতাস সে রাত্রে তার সকল শৈত্য ... অতি নির্মম ভাবে বইতে লাগল মুমূর্ষু পাতাদের নিঃ... নিঃশ্বাসে। সকল জীব অতি সন্ত্রস্ত ভাবে সে যামিনী ... করল।

পরদিন ভোরের প্রথম আলো ফোটবার সংগে স... কাকেরা দেখল, কাঠবিড়ালিটি দেখল আর মাকড়... দেখল গত রাত্রের ঠাণ্ডায় মৌমাছিটির মৃত্যু হয়েছে। ... প্রাণহীন ছোট্ট দেহটি একরাশ টলটলে শিশির কণার ... পড়ে রয়েছে বাদামের হলুদ পাতাটির ওপর। তার নি... চোখ দুটি তখনও আকাশের দিকে নিবদ্ধ—সে আ... অনেক বড় আর আলোয় ভরা।

পতঙ্গভরা কলস উদ্ভিদ, মৌমাছিটি এই কলসের রসেই নিমজ্জিত হয়েছে।



23 সারকুলার গার্ডেন রিচ রোড, কলিকাতা—23

15108